OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 763 - 771
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের ভ্রমণ সাহিত্যে বাঙালি নারীর স্বদেশ চেতনা : প্রসঙ্গে ‘ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা’

ড. সান্ত্বনা দেওঘরিয়া
Email ID : santanabzr@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Renaissance, abroad, impact, consciousness, travelling atrocities, oriental, travel - literature, emerged, patriotism.

Abstract
The 19th century was the period of Renaissance. It had brought about a great impact on Bengali literature and society under the influence of Western education. Rammohan Roy, Vidyasagar and others were the forerunners of this change. Renaissance spirit awakened a new consciousness in the minds of the Bengalee sin the 19th century. Travelling to abroad in the 19th century was an adventure. At that time, many obstacles had to be overcome to travel abroad. When Ram Mohan Roy, Dwarakanth Thakur went to England, the society was steeped in superstition. Ignoring many obstacles, they had to go abroad. Later many had to endure different social atrocities for going abroad. They used to be motivated by patriotism by travelling abroad. The Bengalees love to travel. Travelling from one end of the country to the other, they try to get to know the way of life of those places in detail. They brought from abroad the oriental way of life and sympathy for the oppressed countries. Travel - literature began to be published as a result of these travelling in the 19th century. Here, the contribution of women as well as men were in no way less. For women's education, women's progress, Krishna Bhavini Das had contributed much. She also made attempts to educate girls, standing by them. She went to England with her husband Devendranath Das, leaving her only child daughter Tilottama. There in 1885, she published ‘Englande Banga Mahila’ under the pseudonym ‘Banga Mahila’. Feelings for homeland of a 19th century Bengalee woman is revealed in the book. In this book, she praised the English people for the liberation and improvement of her country. The discussion about the good and bad of the English nation, customs and policies of it, brought up the sorrows and sufferings of our own country. A deep love for the country has emerged in this book. The book has total twenty chapters. Each chapter has feelings and deep respect for the country. The patriotism of the Bengalee women in the 19th century is really commendable in this book.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

উনিশ শতক হল নবজাগরণের কাল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় নবজাগরণের যে আলো ফুটে উঠেছিল তারই ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যের উত্তরণ ঘটেছিল। তবে যে শুধু সাহিত্যে এমনটা নয়, সমাজেও ব্যাপক পালাবদল ঘটেছিল। এই পালাবদলের প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ – ১৮৩৩ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ – ১৮৯১ খ্রি.), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ – ১৮৯৪ খ্রি.), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০৩ খ্রি.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১ – ১৯৪১ খ্রি.) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষে যখন অরাজকতা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন সেই অরাজকতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এই মহান ব্যক্তিত্বেরা। স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজকে নবচেতনার আলোকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁরা। যার ফলে সমাজের পালাবদল ঘটে। সমাজ, সাহিত্য এক নতুন পথে চালিত হতে থাকে। যার অন্যতম পরিণতি হল দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্য।

উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে বাঙালির মননে, চিন্তনে এক নবচেতনা জাগ্রত হয়, বাঙালি নবচেতনার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। উনিশ শতকে বিলেত ভ্রমণ করার অর্থই হল এক দুঃসাহসিক কাজ। তখন বিলেত ভ্রমণ করতে গেলে বহু বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতে হত। ঠিক যেমন রামমোহন রায় (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ – ১৮৩৩ খ্রি.) এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ – ১৮৪৬ খ্রি.) যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন বাঙালির সমাজজীবনে ছিল কুসংস্কারে নিমজ্জিত। তাকে উপেক্ষা করেই তারা বিলেতে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যারা গিয়েছিলেন তাঁদেরকেও বহু সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। কখনও সমাজ তাঁদের ত্যাজ্য করেছিল কখনও বা পরিবার। এরপর উন্নত ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা অর্জন, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই উনিশ শতকের বাঙালিরা ছুটেছিলেন বিলেতে। সমাজের নানা কুসংস্কার, সমস্ত বাধা পের করেই তাঁদের যেতে হত বিলেতে। যাত্রাপথ ও গন্তব্যস্থলও খুব একটা সুবিধার ছিল না। সাধারণত পদব্রজে, নৌকায়, ঘোড়ার পিঠে গোরুর গাড়ি করে তারা কোনমতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ করতে পারতেন। এরপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশরা ট্রেন, বাষ্পচালিত স্টিমার, জাহাজ, ট্রাম ইত্যাদির দ্বারা যাতায়াতের পথ, বিশ্রামস্থল এবং দর্শনীয় স্থানগুলির উন্নতি সাধন করে। যার ফলে বাঙালির মধ্যে ভ্রমণের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলে। বাঙালিরা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে কুসংস্কারমুক্ত হয়।

দেশে - বিদেশে ভ্রমণ করে তাঁরা দেশাত্মবোধে আপ্লুত হন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে গিয়ে সেখানকার জীবনধারাকে নিবিড়ভাবে জানার চেষ্টা করে ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি। আর বিদেশ থেকে বহন করে এনেছিলেন পাশ্চাত্য জীবনবোধ এবং পরাধীন দেশের জন্য সহমর্মিতা। উনিশ শতকে বাঙালির এই ভ্রমণের পরিণামে প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক ভ্রমণসাহিত্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১ – ১৯০৫ খ্রি.) 'আত্মজীবনী', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪ – ১৮৮৯ খ্রি.) 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ – ১৯৪১ খ্রি.) 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী', দুর্গাচরণ রায়ের (১৮৪৭ – ১৮৯৭ খ্রি.) 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' প্রভৃতি ভ্রমণসাহিত্য রচিত হতে থাকে উনিশ শতকে। এই সাহিত্যগুলির মধ্যে আমরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভারতের ভ্রমণ চিত্রটি দেখতে পাই। আর সমাজের এই পালাবদলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানও কোন অংশেই কম ছিল না। তবে উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে যে পরিবর্তন তা বঙ্গনারীদের জন্যই। কারণ –

> "উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারীজাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় বেদনাদ্র এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন - মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এ সময় বাংলার চিন্তানায়করা নারীকল্যানেই যেন তাঁদের সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। যার প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ আইনে, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে।"[১]

পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সাহিত্যরচনায় ছিলেন সমান পারদর্শী।

সমাজের দ্বিতীয় স্তরে ছিল নারীদের অবস্থান। শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত বঞ্চিত ছিল এই দ্বিতীয় স্তরের নারীরা। অন্তঃপুরের রংমহালের মধ্যেই যাদের জীবন ছিল আবদ্ধ। তারপর ব্রিটিশরা যখন ভারতকে অধিকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করল তখন ভারতীয় নারীদের মর্যাদা দাঁড়াল পরাধীন দেশের পরাধীন শ্রেণির। স্বাধীন ভারতেও তারা দ্বিতীয় স্তরের আর ব্রিটিশ ভারতেও তাই। তবে এই ব্রিটিশ রাজত্বেই কিন্তু বাংলার নারীরা নারীমুক্তির ও নারীপ্রগতির স্পন্দন অনুভব করতে থাকেন। সতীদাহ প্রথা রোধ (১৮২৯ খ্রি.), বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬ খ্রি.), বাল্যবিবাহ রোধের চেষ্টা (১৮৯১ খ্রি.) ইত্যাদির দ্বারা নারীর অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটতে দেখা গেল। উনিশ শতকে লক্ষ করা গেল স্বদেশীয় ভাবনা। যেখানে যুক্তিবাদ, স্বদেশপ্রেম বিষয়গুলি প্রধান হয়ে উঠেছে। গদ্য ভাষায় সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় —

> "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রি পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।"[২]

শিক্ষা, সমাজ সবদিক থেকেই এক নতুন চেতনা প্রকাশ পেতে থাকল।

দেখা গেল স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন, নানান স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ঘরোয়া শিক্ষা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ইত্যাদির প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল। যার ফলে নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এরপর তারা সেই অন্তঃপুরের রংমহাল থেকে দেশ ও সমাজের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু যে শিক্ষার ক্ষেত্রেই তা কিন্তু নয়, নারীমুক্তি ও প্রগতির আলোকে আলোচিত হল উনিশ শতকের বাঙালি নারীসমাজ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীর কলমে যেমন অন্তঃপুরের নারীদের দুঃখ, কষ্টের কথা ফুটে উঠল "তেমনি নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁরা চিন্তা করেছেন, কিভাবে অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা যায় তার জন্য কেউ কেউ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা অসহায় মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সময়ে তাঁদের লেখনি গর্জে উঠেছে।"[৩] যার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ - ১৯১৯ খ্রি.)।

উনিশ শতকে নারীমুক্তির, নারীপ্রগতির যে দিকগুলি বাংলায় প্রস্ফুটিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল তাদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং ভ্রমণের ফলে তাঁদের ভ্রমণসাহিত্য রচনা। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা 'পথে নারী বিবর্জিতা' এই প্রবাদবাক্যটি তৈরি করে নারীদের অন্তঃপুরে রাখার কৌশল বানিয়েছিলেন। তবে সব পুরুষের মধ্যেই যে এরকম মানসিকতা ছিল একথা বলা যায়না, এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। যাইহোক নারীদের ভ্রমণের জগত ছিল খুবই সীমিত। পিত্রালয়ের বাড়ি বা আত্মীয়ের বাড়ি, পবিত্রতিথিতে গঙ্গাস্নান, মন্দির দর্শন ইত্যাদি ভ্রমণেই বেশি করে লক্ষ করা যেত। নারীর তীর্থস্থান গমনও খুব একটা সহজ ছিল না। পরিবারের কুসংস্কার, নারীর অর্থবল নেই, শরীরের শক্তিতেও তারা ক্ষয়প্রাপ্ত, নারীর তীর্থযাত্রার পথকে সুগম করতে পারেনি। তবে সুযোগ পেলে তারা যেতেন তারকেশ্বর, গঙ্গাসাগর, দেওঘর, কাশী, মথুরা, পুরী এইসমস্ত জায়গা। এই ভ্রমণ পরিধি বাঙালি নারীর ভ্রমণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় - একথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু উনিশ শতকের শিক্ষার স্পর্শে ঘটল সামাজিক রূপান্তর।

তীর্থযাত্রা বাদ দিয়ে নারীরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই চলেছিলেন দেশ - বিদেশ ভ্রমণে। অবশ্য এক্ষেত্রে নারীকে সাহায্য করতেন পরিবারের প্রগতিশীল পুরুষ সদস্যরা। উনিশ শতকের নারীরা সমাজকে অবজ্ঞা করে, সমাজের লাল চোখকে উপেক্ষা করে ইউরোপে, ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা ভ্রমণ করেছিলেন। উনিশ শতকেই আমরা দেখি অরু দত্ত (১৮৫৪ - ১৮৭৪ খ্রি.) ও তরু দত্ত (১৮৫৬ - ১৮৭৭ খ্রি.) এই দুই বোন তাদের বাবার উৎসাহে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করে এসেছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০ - ১৯২৫ খ্রি.), তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৮৭৬ খ্রি.) কে বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত সমাজসেবিকা হয়েছিলেন। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২ - ১৯২৩খ্রি.) এর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও (১৮৫০ - ১৯৪১ খ্রি.) শিশুদের নিয়ে একা বিলেতে পাড়ি দিয়েছেন জাহাজে করে। সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কারকে ভাঙতে চেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলেত যাওয়া নিয়েও বহু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ঠাকুরবাড়ি পরিবারের ভেতরে ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাইরেও। তবে একথা ঠিক যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলেত ভ্রমণ পরবর্তী বিলেতগামিনীদের পথ অনেকটাই প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

উনিশ শতকের যে সমস্ত নারীরা বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ - ১৯১৯ খ্রি.), কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১ – ১৯২৩ খ্রি.), অবলা বসু (১৮৬৪/ ৬৫ - ১৯৫১ খ্রি.) প্রমুখ। উনিশ শতকের এই বাঙালি নারীরা ছিলেন সামাজিক উন্নতির প্রতীক। তাঁদের দেখানো পথেই পরবর্তীকালে বহু বাঙালি নারী খুব সহজেই বিলেত ভ্রমণ করেছেন। উনিশ শতকের বাঙালি নারীর ভ্রমণ সাহিত্যে যেভাবে দেশপ্রেম বা স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'। ইংলণ্ড নিয়ে এধরনের ভ্রমণকথা কোন বঙ্গনারীই রচনা করেননি এর আগে। ন'বছর বয়সে বৌবাজারের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১২৬৩ – ১৩১৫ ব.) দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একমাত্র শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে রেখে তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ডে যান। সেখানে ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির মধ্যে বহু বিতর্কিত মন্তব্য থাকায় ব্রিটিশ সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির মধ্যে উনিশ শতকের এক বাঙালি নারীর স্বদেশ চেতনা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তবে যে শুধু স্বদেশের প্রতি অনুরাগ সেটাই নয় –

> "তিনি বুদ্ধিমতী ও যুক্তিবাদী ছিলেন। বুঝেছিলেন দেশকে স্বাধীন ও উন্নত করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ দেশগঠনের শিক্ষা। সেক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছিলেন তিনি।"[৪]

তাই এই গ্রন্থটির মধ্যে তিনি ইংরেজ জাতির ভালোমন্দ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন।

কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থে উনিশ শতকের এক নারীর যে স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভ্রমণ হল মানুষের দৈনন্দিন একঘেয়েমির থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়, মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা শিক্ষা ও আনন্দের সমন্বয়ে সুন্দর। তা আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন উপলব্ধির জগত সৃষ্টি করে, নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধানও দেয়, স্বদেশ চেতনাও তার মধ্যে একটি। কারণ ভ্রমণ সাহিত্য শুধুমাত্র সাল বা তারিখ থাকবে তা নয় সেখানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা অবগত হব-

> "কেবল কোনো অজানা-অচেনা স্থানের বর্ণনা ও মানুষজনের টুকরো ছবি এবং সর্বোপরি সাল - তারিখের দড়াদড়ি থাকলেই তো আর 'ভ্রমণসাহিত্য' হয় না।"[৫]

তাই ভ্রমণ সাহিত্যে আমরা পাই চিত্তবিনোদন, সহৃদয় মানসিকতার সঙ্গে বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি, সমাজের সাথে সাথে দেশ, রাষ্ট্র সম্পর্কেও টুকরো টুকরো ছবি যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সত্য ও সুন্দরকে। যা আমরা খুঁজে পাই কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থের মধ্যে।

কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' তে মোট কুড়িটি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে প্রতিটা অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে দেশের প্রতি একটা টান, দেশের প্রতি একটা সুগভীর ভালোবাসা। দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ দেশগঠনের শিক্ষা। তাই তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছেন। ইংরেজ জাতির বীরত্ব, মূল্যবোধ, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি লেখিকা সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। কারন —

> "এই জাতির সাহস, বীরত্ব, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ, নিয়মানুবর্তিতা, পারিবারিক মূল্যবোধ সবই ভারতীয় নারী-পুরুষের কাছে শিক্ষণীয় বলে কৃষ্ণভাবিনীর মনে হয়েছে।"[৬]

তিনি ইংরেজদের গুনগুলিকে তাঁর রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন যার মূল কারণই ছিল ভারতীয়দের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা। লেখিকা নিজেই বলেছেন যে এই বইতে তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি বা নিজের গৌরবের কথাকে প্রকাশ করতে চাননি। তিনি বহু নতুন বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেগুলিকে সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন। সেখানে হয়ত সমাস, সন্ধি বা উপন্যাস, নাটকের বীরত্বপূর্ণ আখ্যায়িকা নেই কিন্তু সেখানে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আছে প্রতিটা মানুষের নিজের কথা। পরাধীনতার গ্লানিতে মানুষ যখন জর্জরিত, যখন অসহায়, নিঃসহায়, স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার প্রভেদ কতখানি তা আমরা এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই —

> "কেবল স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবেন।"[৭]

পরাধীনতার গ্লানিতে ভারতবাসী যখন জর্জরিত তখন যেমন উচ্চারিত হয় —

> "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
> দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?"[৮]

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক ভারতীয় যুবক ইংলণ্ড সম্পর্কে জানবার জন্য ভীষণভাবে উদগ্রীব। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমরা বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় জানতে পারি।

কৃষ্ণভাবিনী ছিলেন গৃহবন্দী এক নারী যেখানে পৃথিবীর কোনো বিষয় সম্পর্কে তিনি জানতেন না। তবে সামান্য বিষয়কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে তিনি পারতেন না। দেশের ব্যাপারে জানার জন্য তিনি 'লালায়িত' হতেন কিন্তু বিলেতের কথা শুনলেই তাঁর মন নেচে উঠত, -

> "বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নতুন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূরণ হয় না, সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম।"[৯]

তাই তিনি সমাজকে উপেক্ষা করেই, আত্মীয়দের নিষেধকে অগ্রাহ্য করে, ছ'বছরের কন্যা তিলোত্তমাকে শ্বশুরের কাছে রেখে স্বামীর সঙ্গে বিলেতে আসেন তিনি। ইংলণ্ডকে জানবার ইচ্ছা কমবেশি সকলেরেই আছে। সেই ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত দেবার জন্যই তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন —

> "বোধহয় ইংলণ্ডের জানিবার নিমিত্ত আমার মতো আপনাদের মধ্যে অনেকের মনে কৌতূহল জন্মে, সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার বাসনায় আমি এই 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'কে আপনাদের করে অর্পণ করিলাম।"[১০]

এই গ্রন্থখানি এক ঐতিহাসিক দলিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় —

> "ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভাবিনী দাসের ঐতিহাসিক বিলাত ভ্রমণকাহিনি এবং প্রথম ভারত ভ্রমণকারী লেখিকা হিসেবে প্রসন্নময়ীর পুস্তক প্রকাশ বাঙালির সাহিত্য ও ভ্রমণ ইতিহাসে সামান্য হলেও দাগ কেটেছিল।"[১১]

ইংলণ্ড যাওয়ার পথে লেখিকার দেশের জন্য একটা কষ্ট অনুভব করেন। কলের গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ, বহু সংখ্যক মানুষ থাকলেও —

> "কিন্তু আমার মতো কি কাহারও মনে এত কষ্ট হইতেছে? বোধ হয় না।"[১২]

কেউ যাচ্ছেন বিদেশে আবার কেউ বা ফিরে আসছেন দেশে তাই তাদের হয়ত সেভাবে কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু "আমার মতো কি কেহ স্বদেশ ছাড়িয়া অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতেছে? বোধহয় না; তবে আমার এ কষ্টের সহিত আজ অন্য কাহারও কষ্টের তুলনা হয় না।"[১৩] এখানেই আমরা লক্ষ্য করছি জন্মভূমির প্রতি লেখিকার একটা গভীর টান, একটা গভীর ভালোবাসা। যত পথ অগ্রসর হয় ততই তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। ভারতের মহিলারা যে স্বাধীনতা সুখ থেকে বঞ্চিত তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মনে বড়ো আহ্লাদ হইল, আবার দুঃখও হইল, আহ্লাদ-আমি স্বাধীন, দুঃখ-ভারতমহিলারা এ স্বাধীনতা সুখ জানেন না।"[১৪]

চারিদিকের মনোরম পরিবেশ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে লেখিকার স্বদেশের জন্য ব্যাকুলতাও, যা গ্রন্থটির মধ্যে স্বদেশ চেতনার এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে একেবারে কলকাতা থেকে শুরু করে ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থ মুম্বাই এবং আরব সাগরের তীরবর্তী মুম্বাই থেকে এশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর ঘুরে ইতালির ভেনিস পর্যন্ত দীর্ঘ পথের নিখুঁত বিবরণ এখানে দিয়েছেন লেখিক। ভেনিস থেকে রেলপথে ও সমুদ্রপথে লণ্ডনে পৌঁছানোর গল্পও এখানে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লণ্ডনে তাঁরা তিন বছর ছিলেন সে কথাও ব্যক্ত করেছেন লেখিকা।

ইংলণ্ডে বসবাসের সময় সেখানে লেখিকার যে স্বদেশপ্রেমের কথা আমরা জানতে পারি তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। জব্বলপুরে তিন জাতির মানুষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যথা একজন বাঙালি, একজন মারহ্রাট্টি, একদল পশ্চিমবাসী লোক, এরা একদেশের হলেও ভাষা, চেহারা, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা। এদের মধ্যে মারহ্রাট্টিদের অর্থাৎ শিবাজীর স্বজাতীয়দের ভীষণভাবে প্রশংসা করেছেন কারণ শিবাজী ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমী। এই জন্য এই বীরপুরুষকে তিনি সম্মান করেছেন, তাঁর বীরত্বকে প্রশংসা করেছেন। জব্বলপুরের অতি সুন্দর পার্বত্য এলাকাও মধ্যেও লেখিকার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে "আমার দেশীয় পরাধীনা ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হইল; তাঁহারা যদি এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পান তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মত তাঁহাদেরও আনন্দ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা এ সকল সুখে বঞ্চিত।"[১৫] লেখিকার প্রতিটা মুহূর্ত দেশের কথা মনে পড়েছে, মনে পড়েছে উপেক্ষিতা বঙ্গনারীদের। কারণ উনিশ শতকের বঙ্গনারীরা সহজে বাইরে বের হতে পারতেন না এমনকি তাদের পড়াশোনাও করতে হত অন্তঃপুরের মধ্যেই -

> "উনিশ শতকে অন্তঃপুর নারীরা নিজের হৃদয়ের অন্দরমহলের কথাকে সম্বল করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের পড়াশোনা অন্তঃপুরের মধ্যেই।"[১৬]

এই অন্তঃপুরের নারীদের জন্য তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছে বারংবার। সেই উপেক্ষিত মন নিয়েই তিনি পাড়ি দিয়েছেন বিলেতে। তিনি স্বদেশের বুকে স্বাধীনতা দেখতে চেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন দেশকে উন্নত করতেই হবে, তাই নিজ দেশের জন্য ব্যথিত হয়েছে লেখিকার মন —

> "আজি প্রিয় দেশ! স্বদেশরতন!
> ত্যজিনু তোমারে বহুদিন তরে,
> ভেবনা জননি! অভাগী কন্যারে,
> কোন উপকারে এলনা যখন।"[১৭]

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি যে যখন লেখিকারা ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চললেন তখন এক চাপা কষ্টের অনুভব –

> "যে ভারতবর্ষে জন্মাইয়াছি, ও এতদিন রহিয়াছি, যাহাকে অন্তরের সহিত ভালোবাসি, যাহার হীনবস্থা দেখিয়া কোনো উপকার করিতে পারি না বলিয়া আত্মাকে ধিক্কার দি, আজ সেই প্রিয়স্থান ছাড়িয়া জানি না কতদিনের জন্য চলিলাম।"[১৮]

তিনি মনকে শক্ত করে ভারতবর্ষের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই অধ্যায়ে যেমন একদিকে স্বদেশের প্রতি একটা কষ্ট, বেদনা অনুভব দেখতে পাচ্ছি তেমনই মুম্বাই থেকে ভেনিস যাত্রার যে বিবরণ তা ভীষণই রোমাঞ্চকর এবং সৌন্দর্যময়। আকাশের তারা ও নক্ষত্র দেখে লেখিকার বক্তব্য—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ভাবিলাম ইহারাই কি আমাদের সেই ভারতবর্ষের তার? ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এত দূরে আসিয়াছি, এখানেও কি আবার সেই সকল তারা দেখিতে পাইব?"[১৯]

কলকাতার ছাদের উপরে আকাশে যে নক্ষত্র দেখতেন সেই পরিচিত নক্ষত্রদের দেখে লেখিকার মন আহ্লাদিত হয়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডে পৌঁছে সেখানকার আদব কায়দা, খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছুই ইংরেজি ধরনে চলতে থাকে। এখানে তিনি আমাদের দেশের দুরাবস্থার অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন যার মধ্যে অন্যতম হল —

> "আমাদের দেশীয় লোকদের উপহাসই আমাদের দেশের উন্নতিপথের কণ্টক হইয়াছে।"[২০]

হয়ত এই বিষয়টি প্রথমদিকে সব দেশেই কমবেশি রয়েছে কিন্তু –

> "আমাদের দেশে সে অবলম্বিত বিষয় ভালো হইলেও লোকে তাহা হইতে বিমুখ হয়, আর এ সব দেশে তাহার আদর করে।"[২১]

এই কারণেই হয়ত বিদেশ এত উন্নত। অনেকেই বলেন যে যারা ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে যায়, তারা স্বদেশের নিন্দা ও ঘৃণা করেন কিন্তু লেখিকা একথা মানতে নারাজ, কেননা —

> "ইহা কতদূর সত্য তাহা জানি না, কিন্তু আশা করি এমন কেহই নাই যে মাতৃভূমিকে ঘৃণা করিবে।"[২২]

লেখিকার এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তাঁর স্বদেশ প্রীতি ছিল হৃদয় থেকে। বিদেশের নতুন দেশ, নতুন শহর, নতুন গাছ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে একটা আনন্দ থাকলেও আমাদের ভারতবর্ষেরও একটা নিজস্ব রূপ আছে, সেখানে প্রকৃতির যে অপরূপ শোভা তা আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। লেখিকার মতে —

> "আমাদের দেশের হিমালয় পর্বতের নিকট গেলে যেমন অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সেরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে না।"[২৩]

শুধু তাই নয়, পাশাপাশি রাজবাটী, অট্টালিকা, তাজমহল এসবের সাথে কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না।

ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন সেখানের মানুষ, শিক্ষিতরা কতটা অর্থলোলুপ, তাদের কাছে টাকার এতই কদর যে-

> "কেহ যতই জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান হউন না, লোকে তাঁহাকে ফেলিয়া একজন অপদার্থ বড়োমানুষের অধিক সমাদর করিবে।"[২৪]

কিন্তু আমাদের দেশে একজন দরিদ্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কেবল টাকাতেই ইংরেজদের এত অহংকার। তবে তিনি ইংরেজদের খারাপ দিকগুলির পাশাপাশি ভালো দিকগুলিও আলোচনা করেছেন। তাদের পড়াশোনা, পরিশ্রম, তেজ প্রভৃতির গুনেই তারা আজ উত্তম আর আমরা "ভারতবর্ষীয়েরা নিজদোষে ইংরেজদের অধীন হইয়া আছি, এবং আমাদের অক্ষমতা বশতই বিদেশীয়েরা স্বার্থপর ভাবে ভারতের উপর রাজত্ব করিতেছে।"[২৫]

আমাদের দেশে পুরুষরা বাইরের প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারলেও নারীরা সেই অধিকারে সম্পূর্ণ বঞ্চিত অথচ ইংরেজ রমণীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান লণ্ডনের উদ্যানে, জলে সর্বত্রই। ইংলণ্ডের লোকেরা ভ্রমণ প্রিয়, তারা অর্থ সঞ্চয় করে পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায় কারণ তারা জানেন যে ভ্রমণ মানবজীবনের ক্ষেত্রে কতটা উপকারী। আমাদের ভারতে যেমন ধনীর দুলালরা অলস প্রকৃতির হয় ইংরেজরা ঠিক তেমন নয় তারা ছোটবেলা থেকেই শেখে স্বনির্ভর হতে। ইংরেজ জাতির বিরূপতার পাশাপাশি তিনি তাদের প্রশংসাও করেছেন। এখানের নারীরা বিলাসী, ছলনাময়ী হলেও তারা কিন্তু যথার্থ নারিশক্তি রূপে প্রকটিত। তাদের মধ্যে আছে শিক্ষা, স্বাধীনভাবে স্কুল, কলেজে যাওয়ার অধিকার। তবে কি শুধু পুঁথিগত শিক্ষায়? না। এর পাশাপাশি "ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা মনের সহিত শরীরেরও বিলক্ষণ যত্ন লয়।"[২৬] তাদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনেও আছে অবাধ স্বাধীনতা। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা অনেক উন্নত এইভাবে যদি এদেশেও মানুষদের শিক্ষিত করা যায় তাহলেই উন্নতিও সম্ভব।

ইংলণ্ডের সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি আমরা 'ইংলণ্ডের বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে পাই। তিনি ইংলণ্ডের গৌরব দেখে ভারতীয়দের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় পুরুষরা হীনবল তার সাথে তারা স্ত্রীদের রেখেছে অন্ধকারে, অন্তঃপুরে। এই প্রসঙ্গে লেখিকার বক্তব্য —

> "স্ত্রীলোক ও পুরুষের সভা, স্ত্রীলোক ও পুরুষের এক সঙ্গে খেলা, প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদের শ্রেণিবদ্ধ হইয়া স্কুলে যাওয়া — এই সকল দেখিতে অধিক ভালবাসি..."[২৭]

তিনি ইংলণ্ডের সব থেকে ভালবাসেন নারী-পুরুষের এই সহাবস্থানটি। লেখিকা অনুভব করেছেন ভারতের নবজাগরণ প্রয়োজন। শুধু 'স্বাধীন হইব', 'স্বাধীন হইব' বলে মিথ্যা উত্তেজনা দিয়ে হবে না দেখতে হবে আমরা স্বাধীনতার উপযোগী কিনা, স্বাধীনতাকে আমরা বজায় রাখতে পারব কিনা। তাই গ্রন্থটির শেষে লেখিকা আশা-আকাঙ্ক্ষার-বেদনার সার্বিক রূপরেখা দিয়েছেন।

কুসংস্কারগ্রস্ত ভারতীয় সমাজকে ধিক্কার জানিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী। তিনি যখন ইংলণ্ডে এসেছিলেন তখন তাঁর শ্বশুরমশায় তাঁর একমাত্র কন্যা তিলোত্তমার অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন কিন্তু যখন তিনি এদেশে ফিরে আসেন, যখন দেখেন মেয়ে দাম্পত্য জীবনে অসুখী তখন তিনি মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন, -

> "অনিত্য সংসারে স্বামী-পুত্র কেবা কার, সবই যে দুদিনের খেলা। নারী কেবল দাসত্ব করবার জন্যই পৃথিবীতে আসেনি, পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে তার ক্রীড়াসঙ্গিনী হবার জন্যেও নয়, মেয়েরা বেঁচে থাকে নিজের জন্যেও।"[২৮]

কিন্তু তিনি মেয়েকে বোঝাতে পারেননি, অকালে শেষ হয়ে যায় মেয়ের জীবন। যেরকম ঘটনা আমরা দেখতে পাই আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯ – ১৯৯৫ খ্রি.) 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতীর জীবনেও।

তিনি সারাজীবন নিজেকে দেশ ও সমাজের সেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন। নারিপ্রগতির কর্মকাণ্ড দিয়ে এর সূত্রপাত করেছিলেন। নারীদের জন্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, ঘুরে ছিলেন কলকাতার পথে পথে। সব দিক থেকে নারীদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন উনিশ শতকের এই বঙ্গমহিলা। তখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনও বাঙালি মহিলার দ্বারা রচিত এমন বিস্তৃত ভ্রমণ কাহিনি আর প্রকাশিত হয়নি। আর উনিশ শতকের ভ্রমণসাহিত্যে কৃষ্ণভাবিনী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' তে যেভাবে স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

Reference:

১. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ৯৯
২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯০৪, পৃ. ৬৩
৩. দে, নাড়ুগোপাল, উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী, ২০১০, পৃ. ২৪৮
৪. মুখোপাধ্যায়, সোনালি, পরাধীন ভারতে পরাধীন নারী, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৭
৫. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৫, পৃ. ৪০০
৬. মুখোপাধ্যায়, সোনালি, তদেব, পৃ. ২৮
৭. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা, বিজিত ঘোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ১১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 771
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১০-২০১১, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২৪
৯. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১১
১০. তদেব, পৃ. ১১
১১. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা, তৃতীয় পর্ব, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১২
১২. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১৩
১৩. তদেব, পৃ. ১৩
১৪. তদেব, পৃ. ১৩-১৪
১৫. তদেব, পৃ. ১৬
১৬. দে, নাড়ুগোপাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ (সম্পাদনা), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃ. ৩১
১৭. প্রমীলা, স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তদেব, পৃ. ১৯
১৮. তদেব, পৃ. ২২
১৯. তদেব, পৃ. ২৬
২০. তদেব, পৃ. ৪০
২১. তদেব, পৃ. ৪০
২২. তদেব, পৃ. ৪১
২৩. তদেব, পৃ. ৪২
২৪. তদেব, পৃ. ৫৩
২৫. তদেব, পৃ. ৫৭
২৬. তদেব, পৃ. ৬৯
২৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
২৮. দেব, চিত্রা, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০৫, পৃ. ৬৮